গল্প-সল্প

শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি-এ

মূল্য ॥০ আনা।

প্রকাশক—

শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি. এ.,

শিশির পাব্লিশিং হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট

কলিকাতা

কলিকাতা—৩৩ নং গৌরীবেড় লেন,

সূর্য্য প্রেস

প্রিণ্টার শ্রীসুবোধ চন্দ্র সরকার।

নিবেদন

এই গল্পগুলির অধিকাংশই বিদেশী বইর ছায়া অবলম্বনে লিখিত। গল্পগুলির মধ্য দিয়া ছেলেমেয়েরা কিছু নীতি কথা শিখিতে পারিবে—আশা করি। ইতি—

শিশির পাব্লিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র,

২৫শে শ্রাবণ, ১৩২৯

গল্প-সল্প।

লীলা

ফুটফুটে চেহারা, যেমন গড়ন তেমনি রূপ—একটি মেয়ে ছিল—নাম তার লীলা। রূপের তার তুলনা ছিল না—যে দেখিত সেই ভাল বাসিত। কিন্তু এই ভালবাসা যে কেবল রূপেরই জন্য—তা নয়, অন্য কারণ ছিল।

লীলা উঁচু গলায় কথা বলে না; কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করে না; যা পায় তাইতেই সন্তুষ্ট থাকে। অত ছোট মেয়ের আশ্চর্য্য দয়ার কথা শুনিলে কে আর তাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে? কারও দুঃখ কষ্ট সে দেখিতে পারে না। পুষী বিড়াল, অজয়া বাছুর, এ সবকেও সে এত

ভালবাসে যে সে ছাড়া আর কারও হাতে তারা খাইতে চাহে না। পাড়ার যত দুঃখী, অনাথ,—তাদের কষ্টে লীলার মন গলিয়া যায়। সে তাদের সঙ্গে গল্প সল্প করিয়া নানা রকমে তাদের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করে। এর বাড়া তার যেন আর জীবনে অন্য কাজ ছিল না। গরীব দুঃখীরা জানিত লীলা তাহাদেরই। এমনি করিয়া লীলার নাম রটিয়া ছিল—'দুঃখীদের লীলা'।

কিন্তু লীলার নিজের দুঃখও গরীব দুঃখীদের চেয়ে কম ছিল না। খুব অল্প বয়সে তার বাপ, মা, ভাই, বোন, মারা গিয়াছিল, তার উপর গরীবের মেয়ে সে—পয়সা কড়িও মোটেই ছিল না; তাই লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই তাহাকে দূর-ছাই করিতে লাগিল। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াও কোথাও আশ্রয় পাইল না। শেষে গ্রামের দশজনে মিলিয়া তাকে তার মামার বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

কিন্তু গরীবের দুঃখ সব যায়গায়। মামার

বাড়ীতেও তার হেনস্থার সীমা ছিল না। রান্না করা, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কাপড় কাচা, গরুকে খাবার দেওয়া সবই তার নিজের ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিল। কিন্তু এমন উদয় অস্ত খাটিয়াও নিস্তার নাই। মামা, মামী রাত্রে শুইলে লীলাকে তাদের মাথার কাছে বসিয়া দুপুর রাত পর্য্যন্ত বাতাস করিতে হইত—এতটুকু ছোট মেয়ের যে এত কাজ করিতে কষ্ট হইতে পারে সে কথা একবারও তারা ভাবিত না। কিন্তু লীলার মুখে টুঁ শব্দটি ছিল না। মামা মামীর হুকুম মত সব কাজই সে হাসি মুখে করিত।

কিন্তু এত দুঃখ কষ্টেও নিজের কাজ সে কিছুতেই ছাড়িতে পারিল না। গরীব দুঃখীদের সে লুকাইয়া আগের মতই সাহায্য করিত। অনাথ দুঃখীদের কষ্ট তার বুকে শেলের মত বিঁধিত। তাই নিজে না খাইয়াও সে তাদের লুকাইয়া খাওয়াইত। যাদের আশ্রয় নাই—লুকাইয়া ডাকিয়া আনিয়া নিজের বিছানায় তাদের

শোয়াইত। আর আপনি সমস্ত দিন খাটনির পর রাত্রে মাটীতে শুইয়া আরামে ঘুমাইয়া পড়িত—এমনি ভাবে দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন মামারা মস্ত বড় এক ভোজ দিলেন। সে ভারী ধুম। কত লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে—বামুন, কায়স্থ সকলে সারি সারি বসিয়া গিয়াছে—চারিদিকে হৈ চৈ, দৈ লুচির ছড়াছড়ি।

লীলা খাবার যায়গার পাশেই ঝাঁটা হাতে দাঁড়াইয়াছিল। মামা ত আর তাকে ভাগিনী বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। তাই ঝি সাজাইয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল—পাতা কুড়াইবার জন্য।

একবার, দুইবার তিনবার খাওয়া হইয়া গেল। লীলা পাতা কুড়াইয়া রাস্তায় ফেলিতেছে, জায়গা পরিষ্কার করিতেছে—হাঁফ ছাড়িবার সময় নাই।

ক্রমে সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গেল। মামা, মামী শুইতে গেলেন; বাকী রহিল খাইতে শুধু লীলা—সে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া গা

হাত পা ধুইয়া খাইতে যাইবে, হঠাৎ এক ভিখারিণী আসিয়া হাজির।

ভিখারিণী বুড়ী, দেখিতে ভারী বিশ্রী, যেমন ময়লা ছেঁড়া কাপড়, তেমনি রুখ্যু, উস্কো-খুস্কো কটা চুল, তেমনি কালো মিস্‌মিসে রঙ, যে দেখে সেই তাকে দূর দূর করে। সকলের কাছে তাড়া খাইয়া সে ক্ষুধার জ্বালায় শেষে লীলার কাছে আসিল।

ভিখারিণীকে দেখিয়া লীলার বড় দুঃখ হইল। সে আস্তে আস্তে বুড়ীকে আড়ালে লইয়া যাইয়া বলিল, "ভাই, ভাঁড়ার ঘরে তো ঢোকবার হুকুম নেই, আর আমি চাইলেও ওরা কিছু দেবে না, তবে এক কাজ কর আমার যে খাবার আছে তাই আজ খাও।"

সে ভিখারিণী মহা আরামে লীলার সব খাবার খাইয়া ফেলিল। তারপর লীলা তার আশ্রয় নাই শুনিয়া নিজের স্যাতসেঁতে ঘরে যে ছেঁড়া বিছানা ছিল তাই পাতিয়া দিল বুড়ীকে

শোবার জন্য। আর নিজে—খুদ কুঁড়া যা কিছু এদিক ওদিক কুড়াইয়া পাইল, তাহাই খাইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল।

পরদিন ভোরে লীলা না জাগিতেই বুড়ী চলিয়া গেল। তাকে বলিয়া পর্য্যন্ত গেল না।

রাত্রে আবার বুড়ী চুপি চুপি আসিয়া হাজির। লীলা আবার লুকাইয়া নিজের খাবার দিল, নিজের বিছানা দিল। বুড়ী মহা আরামে ঘুমাইতে লাগিল।

বুড়ীর ভাব দেখিলে মনে হয় সে যেন ভাবে, ও খাবার তারই। লীলা যে খাইতে পায় না, শুইতে বিছানা পায় না, সে তাহা দেখিয়াও দেখে না।

শুধু কি তাই? মাঝে মাঝে আবার তম্বিও করে। বিছানা খারাপ, খাবার মোটেই ভাল নয়, এমনি আরও কত কি! লীলা কিন্তু হাসি মুখে বুড়ীর সব অত্যাচার সহ্য করে। লোকের দুঃখ দেখিলে তার ভারী কষ্ট হয়, দুঃখীর মুখে হাসি

দেখিলে সে জগত সংসার সব ভুলিয়া যায়। এমনি ভাবে দিন কাটে!

লীলা আধপেটা খাইয়া, মাটিতে শুইয়া দিন দিন রোগা হইতে লাগিল।

মামা বলে, "ও লীলা, তোমার এমন চেহারা হইতেছে কেন? তুমি কি খেতে পাও না?"

মামী অমনী ফোঁস করিয়া উঠেন, "কি? আমি খেতে দিই না? তবে হাঁড়ী হাঁড়ী ভাত, কাঁড়ী কাঁড়ী ডাল যায় কোথা? বলুক না; ওই বলুক না।"

মামীর ধমক খাইয়া লীলার মুখ শুকাইয়া যায়; তবু সে চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলে "না— আমি বেশ আছি"।

লীলা সত্য সত্যই ভাবিত, সে বেশ আছে। পরের দুঃখ দূর করিতে যে কত সুখ সে যারা পরের দুঃখ দূর না করিয়াছে তারা জানে না, বলিলেও বুঝিবে না।

বুড়ী এই রকম পনর, দিন ধরিয়া অনবরত

আসিল আর গেল। ক্রমে লীলার সঙ্গে কথা বলাও ছাড়িয়া দিল। ভাত ডাল যা থাকে খায়, খাইয়াই শুইয়া পড়ে।

শেষে এক রাত্রে একটা বিড়াল সঙ্গে আনিয়া বলিল—

"ও লীলা, আমি বোন, কদিনের জন্য বিদেশ যাব, তাই আমার এই বিড়ালটা রইল। আমি যে ভাত খাই আমার না আসা পর্য্যন্ত—ওই সে সব খাইবে। আর যে বিছানায় শুই ওই সেইখানে শুইবে।"

বুড়ী এমনভাবে কথা বলিল যেন—তার নিজেরই সব ঘর-বাড়ী, খাবার, বিছানা।

লীলা কিন্তু একটুও আপত্তি করিল না, হাসিতে হাসিতে বিড়ালটিকে কোলে করিয়া বলিল,—

"আচ্ছা"

বুড়ী চলিয়া গেলে লীলা আগের মতই তাহার নিজের সব খাবার দাবার বিড়ালটিকে ধরিয়া

হাসিতে হাসিতে বিড়ালটাকে কোলে করিয়া বলিল, "আচ্ছা"

দিল। বিড়ালটাও ম্যা মো টু টঁা কিছু না করিয়া সমস্তই খাইয়া ফেলিল। খাবার পর লীলা বিছানা দেখাইয়া দিল। বিড়াল শুইল।

ক্রমে না খাইয়া খাইয়া লীলার উপোস করা অভ্যাস হইয়া গেল। শীতের রাত্রি—লীলা আড়ষ্ট হইয়া বিড়ালের পাশে বিছানার এক কোণে পড়িয়া থাকে। সমস্ত দিন খাটিয়া রাত্রে আর তাহার হুঁস থাকে না।

এদিকে মামা মামী রোজ রাত্রে শুনিতে পায় লীলার ঘরের ভিতরে যেন কিসের শব্দ হয়। একদিন দুজনে উঠিয়া, চুপি চুপি পা টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে গেল—লীলা করে কি? দোরের কাছে গিয়াই দুজনে অবাক,—এদিকে গন্ধ, ওদিকে গন্ধ, যেন হাজার হাজার ফুল ফুটিয়াছে, লীলার ঘরের চারিদিকের বাতাস পর্য্যন্ত যেন গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে ভারী হিংসা হইল—এত গন্ধ কোথা হইতে আসে? ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখে লীলা শুইয়া আছে রূপার খাটে, সোনার

পাটার উপর। আর তার পাশেই একটা বিড়াল। কি সুন্দর তাহার চেহারা—রঙ যেন তাহার জ্বল জ্বল্ করিতেছে। আর চাঁদের আলোর মত একটা কিসের স্নিগ্ধ আলো যেন তার সমস্ত গা ফাটিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছে। তারই পাশে বসিয়া এক ভিখারিণী বুড়ী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে।

মামা—মামী আশ্চর্য্য হইয়া কান পাতিয়া শুনিল, বুড়ী বিড়ালটাকে বলিতেছে—

"ও পরীর দেশের রাজা, এখন তো তোমার সন্দ মিটিয়াছে, এখন বল পৃথিবীতে ভাল লোক আছে কি না ?"

"তাইত দেখছি রাণী, পৃথিবীতেও ভাল লোক আছে।"

"তবে আমি বাজিতে জিতিয়াছি।

কথাও শেষ হইল, আর কোথা হইতে গান বাজনা দূর দূর স্বপ্নের রাজ্য হইতে যেন ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে একদল পরী

এক দল পরী আসিয়া হাজির।

আসিয়া হাজির ; সকলের বড় যে, সে বিড়ালকে প্রণাম করিয়া বলিল,—

"কি হুকুম ?"

বিড়াল বলিল—

"ওগো সখি, বাজিতে রাণীই জিতিয়াছে—পৃথিবীতে এখনও ভাল লোক আছে। তোমরা এখন যাও, আনন্দের লহর ছুটাইয়া দাও—কাল আমাদের ঘরে এক নূতন অতিথি আসিবে।"

পরীর দল আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

তখন বুড়ী বলিল, বিড়ালকে,—

"তুমি লীলাকে কি দিবে ?"

"সাগর ছেঁচা মাণিক দেবো।"

"আর কি দিবে ?"

"কলসি কলসি সোণা দেবো।"

"আর কি ?"

"পৃথিবীর রাণী করবো !"

শুনিয়া মামা-মামী হিংসায় ফাটিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শান্তা।

শান্তার বয়স ছিল ন' বৎসর, কিন্তু তবু শান্তাকে সবাই চিনিত। তার স্বভাবটা এমনই যে সে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিত না—এর গোয়াল ঘরে, ওর উঠানে, ওর রান্না ঘরে—সব যায়গাতেই শান্তা যাইয়া হুটোপুটি করিত। রামধন পোদ্দারের গাছে কটা লাউ হইয়াছে, শ্যামা কলুর কোন্ বাছুরটা আজ কোন দিকে চরিতেছিল, এ সব খবর আর কেউ না রাখিলেও শান্তা রাখিত। গ্রামের গরীব দুঃখীদের পাড়ায়—যেখানে কেউ যায় না—সেইখানে শান্তা যাইয়া তাদের বাড়ী ঘর ওলোট পালোট করিয়া আসিত —তাই দেশের যত লোক তাকে ডাকিত 'শান্তা দিদি'। তার একটা বাতিক ছিল গাছে চড়িয়া কোথায় কি আছে দেখা। একবার মস্ত উঁচু একটা গাছে চড়িয়া দেখে একটা রাস্তা অনেক দূর

গিয়াছে, কিন্তু সবটা দেখা যায় না। আর যায় কোথা, শান্তা সেই রাস্তা ধরিয়া সরাসর দে ছুট্ দে ছুট্, রাস্তার শেষে যাইয়া তবে নিশ্চিন্ত। এমনি অস্থির, চঞ্চল ছিল শান্তা।

কিন্তু একটা বিষয় শান্তা এখনও কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। ঐ যে সমুদ্রের পাশ দিয়া মস্ত বড় পাহাড় উঠিয়াছে, তার ঐ দিকটায় যে কি করিয়া যাওয়া যায়—তাহার কুল কিনারা সে কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিল না। পাহাড়ের গাটা সেখানটায় এমন ঢালু হইয়া উঠিয়াছে যে, শান্তার মত ছোট্ট মেয়ের কথা দূরে থাকুক, বুড়রা পর্য্যন্ত সেখানে যাইতে হার মানিয়া যায়। কিন্তু তবু ত সেখানে যাইতে হইবে। শান্তা রোজ বিছানায় শুইয়া ভাবে, সব যায়গায় গিয়াছি ওখানে যাই নাই, ওখানটা না জানি কি সুন্দর!

এমনি ভাবিতে ভাবিতে শান্তা একদিন বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিল, এবং পোষাক না পরিয়াই দে ছুট সমুদ্রের দিকে। পাহাড়ের

একটু হইলেই কাঁদিয়া ফেলে, এই সময়ে দূরে দেখে সেই তু আঙুলে মানুষটি। অমনি যাইয়া তু আঙুলের কাছে বলিল,

"মশাই, বাড়ী যাব কোন পথ দিয়ে বলুন না।"

তু আঙুলে ত শান্তাকে দেখিয়া অবাক, রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে বলিল,—

"আরে মলো! এখানে কেমন করে এলি? তোদের পরীদের হাত' থেকে কি কোথাও গিয়ে নিস্তার পাব না? পাঁজী, ছুঁচো, গাধা···"

শান্তা ভারী ভয় পাইয়া কাঁদ কাঁদস্বরে বলিল,

"আমি হীরে মুক্তো চাই না, আমার ক্ষিধে পেয়েছে।"

"এ দেখছি একটা মানুষ, পরী নয়—তা তোরা এত ছোট্ট হলি কবে হ'তে?"

পরী নয় জানিয়া তু আঙুলের স্ফূর্ত্তি দেখে কে? সে তখন শান্তাকে কোলে করিয়া কত আদর সোহাগ করিল। তারপর বলিল,

"খাবার খাবে,তার ভাবনা কি? কি খাবে বল"

এই বলিয়া কতকগুলি পাথরে ফুঁ দিতেই সেগুলি সন্দেশ, রসগোল্লা, চমচম, কচুরী, মিহিদানা, আরও কত কি সুন্দর সুন্দর খাবার হইয়া গেল।

শান্তা তখন মহা আরামে সেগুলি টপাটপ পেটের মধ্যে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

আর ছু আঙুলে—সে তখন যত সব দামী পাথর কুড়াইয়া কোঁচড় ভরিতেছিল।

শান্তার খাওয়া হইয়া গেলে, বলিল,

"এখন তবে যাই।"

ছু আঙুলে আবার তাহাকে কোলে করিয়া চুমো খাইয়া বলিল,

"তুমি ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি হয় ত আমাকে খুব বদরাগী ভেবেছ, ঐ সব পাজী পরীরাই আমাকে বদরাগী করে তুলেছে। বেটীদের কাছ হ'তে কি কোথাও গিয়ে নিস্তার পা'বার যো আছে। যেখানে যাই সেখানেই এসে তারা আমার পাথর চুরী করে। তাই আমি আমার সব পাথর আজ এখান হতে নিয়ে যাব।"

শান্তা দু আঙুলের কোল হইতে কাঁধে চড়িয়া বসিয়াছিল। বলিল,

"কোথায় নিয়ে যাবে চলো।"

দু আঙুলে কোন জবাব দিল না, খালি গম্ভীর ভাবে বলিল, "হুঁ",

শান্তার খুব বুদ্ধি কিনা, সে বুঝিল, দু আঙুলে সে কথা তাকে বলিবে না।

হঠাৎ শান্তার মনে হইল তাহার আঁচলেও অনেকগুলি পাথর আছে। তাই সে দু আঙুলেকে ডাকিয়া বলিল,

"ওগো মশাই, আমাকে বুঝি তুমি খুব ভাল ভেবেছ—না? আমি কিন্তু তা মোটেই নয়। আমিও তোমার অনেক পাথর চুরী করেছিলুম। মাপ করো বন্ধু।"

এই না বলিয়া সে আঁচল হইতে কত রকমের হীরা মুক্তা পাথর সব বাহির করিয়া দু আঙুলেকে দেখাইল।

দু আঙুলে তখন শান্তার উপর ভারী খুসী।

সে বলিল,—

"তুমি ত খুব লক্ষ্মী মেয়ে—এ গুলি সব তোমাকেই আমি দিলুম। কিন্তু খবরদার, কোথা হ'তে এ সব পেলে সে কথা কিন্তু কাউকে বলো না।"

শান্তা বলিল,—"না—সে কথা কাউকে বলব না।"

শান্তা তখন ছু আঙুলের কথামত সেইখানেই শুইয়া পড়িল। শুইতেই যেন তাহার কি রকম ঘুম আসিল। ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে, সে তাহার বিছানায় শুইয়া।

শান্তা বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে ভাবিল,

"আচ্ছা মজার স্বপ্ন ত!"

তারপরই আঁচলে হাত দিয়া দেখে—কি যেন শক্ত পাথরের মত; সেগুলি খুলিয়া দেখে হীরা, মণি, মাণিক্য, সব জল্ জল্ করিতেছে। শান্তা যখন মার, বাবার কাছে যাইয়া সব দেখাইল,

তাহারা ভাবিল তাহারা কি স্বপ্ন দেখিতেছে—সাত রাজার ধন এত হীরা মাণিক কোথা হইতে আসিল।

তারপর মা বলে, বাবা বলে,

"এত ধন রত্ন কোথা হ'তে পেলি রে?"

শান্তা বলিল,—সে কথা দিয়াছে,—সে কথা সে কিছুতেই বলিতে পারিবে না। মা তখন চুমোতে চুমোতে শান্তার গাল ভরাইয়া দিয়া

"ঠিকই ত, সত্য কি কখন ভাঙ্গা যায়!"

তারপর মা জিজ্ঞাসা করিল,

"এত ধন দৌলত নিয়া কি কর্‌বি শান্তা?"

"একটা বড় বাড়ী আর বাগান কিনব।"

"আর?"

"সেখানে রাজ্যের যত গরীব ছেলেমেয়েদের এনে ভাল খাওয়াব, পড়াব আর তাদের নিয়ে আমি সেখানে থাক্‌ব—আমি যে তাদেরই।"

কৃপণের ধন।

মাণিকলাল কৃপণ। জীবনে সে অনেক টাকা রোজগার করিয়াছে। কিন্তু এখনও টাকার মোহ তাহার কাটে নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা তাহার সুদে খাটে। গ্রামে এত বড় ধনী আর কেহ নাই। জীবনে সে একটি পয়সা কাউকে দান করে নাই। কিন্তু ছলে, বলে, কৌশলে সে যদি একটি পয়সাও অন্যায় করিয়া কাহারও নিকট হইতে লইতে পারে—তবে তাহাতে সে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হয় না—এমনই তাহার স্বভাব!

সেদিন ভোর বেলায় সুদের টাকা লইয়া মাণিকলাল বাড়ী ফিরিতেছিল। অতি সাবধানী সে—পাছে নোটের তাড়া দেখিয়া কাহারও কু-মতলব হয়—সেই জন্য জামার ভিতরে নোটের তাড়াটি রাখিয়া দিয়াছিল—যেন তাহার কাছে এক পায়সাও নাই—এমনি ভাব। বাড়ী

পঁহুছিবার আগে মাণিকলাল একবারও জামার পকেটে হাত দেয় নাই—ভয়, পাছে কেউ দেখে। বাড়ী পঁহুছিয়া নোটের তাড়া বাহির করিতে যাইয়া দেখে—সর্ব্বনাশ! নোটের তাড়া নাই—হয়ত বা রাস্তায় কোথাও পড়িয়া যাইয়া থাকিবে।

তিন দিন, তিন রাত্রি মাণিকলাল খায় না, দায় না, দিবারাত্র হা টাকা হা টাকা করিয়া বুক চাপড়ায়। নগদ পাচশত টাকা! একটি পয়সা হারাইলে যে ভাবিয়া আকুল হয়, এত বড় শোক সে কি করিয়া সহ্য করিবে? কাঁদিয়া, কাঁদিয়া, বুক চাপড়াইয়া—তিন দিন পরে মাণিকলাল এক অদ্ভুত জীব হইয়া দাঁড়াইল। মাণিকলালকে দেখিয়া আর চেনা যায় না—যেন কতদিন রোগে ভুগিয়াছে।

তিনদিন পরে মাণিকলাল থানায় যাইয়া উপস্থিত। বরাবর পুলিস সাহেবের নিকট যাইয়া বলিল—

"সাহেব, আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। পাঁচশত টাকা, নগদ পাঁচশত টাকা—বাড়ী ফিরিবার সময় পথে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। সে টাকা আমার চাই-ই—লোক লাগান, তদন্ত করুন—যত খরচ লাগে আমি দিব—সে টাকা আমার চাই—পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিন—চল্লিশ টাকা—নগদ চল্লিশ টাকা পুরাপুরি পুরস্কার দিব—যে টাকাটা আমায় ফিরাইয়া দিবে।"

দারোগাবাবু পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিলেন। মাণিকলাল আশা পথে চাহিয়া ছটফট করিতে লাগিল।

সে গ্রামে থাকিত, এক বুড়ী। বুড়ী রোজ সকালে ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করে, তারপর বেলা হইলে বাড়ী ফেরে! সেদিন গঙ্গা স্নান করিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল, পথে দেখে একটা নোটের তাড়া পড়িয়া। দেখিয়াই বুড়ী চমকিয়া উঠিল। ভগবানের আবার এ কি লীলা! বুড়ী কি ভাবিয়া নোটের তাড়া তুলিয়া লইল।

বুড়ী বড় দুঃখী—ভিক্ষা করিয়া খায়,অনেক দিন উপবাসেই কাটিয়া যায়—দিনরাত্রি সে ভগবানকে ডাকে, "দয়াল প্রভু, এ কি আমার দুর্গতি আমার পাপের শাস্তি কি এখনও শেষ হয় নাই!" বুড়ীর দুঃখের দিনও শেষ হয় না, ডাকাও ফুরায় না।

বুড়ী ভাবিল, ভগবানই তাহার দুঃখে দয়া-পরবশ হইয়া এই টাকা তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তখনই মনের ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল, "না—না—ও ভাবনা নিতান্তই স্বার্থপরের মত—পরের জিনিস—পরের জিনিস লইলে চুরী করা হয়—আমি যাহার জিনিস তাহাকেই ফিরাইয়া দিব।"

তিন দিন তিন রাত্রি বুড়ীরও ঘুম হয় নাই। একদিকে টাকার লোভ, আর একদিকে ধর্ম্মের ভয়! শেষটা ধর্ম্মেরই জয় হইল। বুড়ী নোটের তাড়া লইয়া থানায় জমা দিল—যার টাকা তাকে ফিরাইয়া দিতে।

পুলিশ সাহেব বুড়ীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এতদিন সে টাকার থলি কেন ফিরাইয়া দেয় নাই ! বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে সব কথা বলিল— বড় গরীব সে, তাই কত লোভ হইয়াছিল তাহার এই টাকার উপর, শেষটা সে ধর্ম্মের ভয়ে টাকা ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছে—এই সব। সব শুনিয়া বুড়ীর প্রতি পুলিশ সাহেবের বড় দয়া হইল।

সাহেব তখনই মাণিকলালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মাণিকলাল আসিতেই পুলিশ সাহেব বলিলেন—

"এই আপনার টাকার থলি—এই বৃদ্ধা আনিয়াছে। বুড়ী বড়ই গরীব, টাকার প্রতি তাহার লোভ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়, কিন্তু তাহার ধর্ম্মে মতি আছে, তাই সবটাই সে ফিরাইয়া দিয়াছে।"

মাণিকলাল লোলুপদৃষ্টিতে নোটের তাড়াটার দিকে চাহিল, তাহার পর নোট কয়খানি গণিল।

গণিয়া দেখিয়া নোটের তাড়াটী কোঁচার খুটের সঙ্গে বাঁধিল। তাহার পর বৃদ্ধার আপাদ মস্তক একবার ত্বরিতগতিতে চাহিয়াই সহসা দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল।

পুলিশ সাহেব বিস্মিত দৃষ্টিতে মাণিকলালের এই সব কাণ্ড কারখানা নির্ব্বাক হইয়া দেখিতেছিলেন। শেষটা আকুল বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কিন্তু বুড়ীর পুরস্কারের টাকা?"

সহসা সম্মুখে কাল সর্প দেখিলে মানুষ যেমন শিহরিয়া উঠে, মাণিকলালও সেইরূপ শিহরিয়া উঠিল, ত্রস্তে সে আবার সেই স্থানে বসিল, কি ভাবিয়া আবার নোটের তাড়াটা লইয়া খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করিল, তাহার পর বলিল,

"আমার সাড়ে পাঁচ শত টাকার নোট ছিল, আছে দেখিতেছি পাঁচ শত, বুড়ী নিশ্চয়ই ৫০৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।"

তাহার পর একটু ঘৃণার স্বরে বলিল,

"পুরস্কারের টাকার চাইতে বেশী সে আগেই লইয়াছে—আবার পুরস্কারের দাবী করে ?"

বুড়ী এই কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে নিজেকে একটু সামলাইয়া বলিয়া উঠিল,

"সাহেব, দোহাই আপনার, আপনি একথা বিশ্বাস করিবেন না—কেন আমি পরের পঞ্চাশ টাকা না বলিয়া লইতে যাইব ? তাহাতে কি ধর্ম্ম থাকে, তাহাতে কি ঈশ্বর রাগ করিবেন না ? আর যদি লইবই তবে সবটাই কেন লইলাম না—পাপ যখন সমানই—তবে কেন কতক লইয়া ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে যাইব ?—হা—ঈশ্বর,—"

মাণিকলাল এতক্ষণ খালি অবজ্ঞার হাসি হাসিতেছিল, বুড়ীর কথা শেষ হইতেই সে যেন ঘৃণাভরেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অস্পষ্ট স্বরে কি একটা কথা বলিয়াই আবার ঘর ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল।

পুলিশ সাহেবের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, তীব্র স্বরে তিনি হাঁক ছাড়িলেন,—

"দাঁড়ান আপনি—কত টাকার নোট থলিতে ছিল ?"

"সাড়ে পাঁচ শত টাকার।"

"আগে তবে আপনি পাঁচ শত টাকা বলিয়াছিলেন কেন ?

মাণিকলাল একটু থতমত খাইয়া বলিল,

"ভুলে মশাই, ভুলে।"

"অদ্ভুত ভুল! আচ্ছা বেশ, আপনি ভাবিয়া চিন্তিয়াই বলুন, এখন ত আর ভুল হইতেছে না—আপনার ঐ সাড়ে পাঁচ শত টাকাই হারাইয়া গিয়াছিল ?"

"হ্যাঁ—সাড়ে পাঁচ শত টাকাই আমার হারাইয়া গিয়াছিল।" এই বলিয়া মাণিকলাল নোটের তাড়াটি বাহির করিয়া আর একবার গণিয়া লইল। তাহার পর বলিল—

পুলিস সাহেব ক্ষিপ্র গতিতে নোটের তাড়াটি মাণিকলালের হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন—

গল্প সল্প—পৃঃ ২০।

"কিন্তু ইহাতে আছে মোটে পঞ্চাশখানি নোট—দশ টাকা"...

পুলিশ সাহেব ক্ষিপ্র গতিতে নোটের তাড়াটি মাণিকলালের হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন, তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,

"বুড়ীর কথা মিথ্যা নয়, আপনার কথাও আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাই—আমার মনে হয়, এ নোটের তাড়া আপনার নয়—অন্যের। বুড়ী, তোমার মত ধার্ম্মিকা আমি অল্পই দেখিয়াছি—এই লও তাহার পুরস্কার—"

এই বলিয়া পুলিশ সাহেব সেই পাঁচশত টাকার নোট বৃদ্ধার হাতে তুলিয়া দিলেন—দিয়া বলিলেন,

"এ টাকার মালিক কে আপাততঃ স্থির হইল না, হয় ত হইবেও না, তবে যদি ভবিষ্যতে এই টাকার মালিক কেহ স্থির হয় তাহা হইলে আমি নিজের তহবিল হইতে ঐ পাঁচশত টাকা তাহাকে দিয়া দিব, আর যদি মালিক কেহ স্থির না হয়, তবে সরকারের পক্ষ হইতে তোমার সততার জন্য

এই টাকা তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হইল। যাও বুড়ী, সব টাকা তোমার—আশীর্ব্বাদ করি—তুমি যেন এইরূপ ধর্ম্মপথেই চিরকাল থাকিতে পার।”

বুড়ী ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল।

মাণিকলাল এতক্ষণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া ছিল। বুড়ী টাকা লইয়া চলিয়া যায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

“আচ্ছা, আচ্ছা, আমি পুরস্কারের টাকা দিব, চল্লিশ টাকা লইয়া বাকি টাকা রাখিয়া যাউক।”

পুলিশ সাহেব হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, “সে আর হয় না বাপু, পরের টাকা আপনাকে আমি দিব কেমন করিয়া?—ঐ সাড়ে পাঁচশত টাকা যদি পাওয়া যায় তখন নিশ্চয়ই আমি নিয়া আপনাকে ডাকিয়া দিব—আপনাকে আর তখন পুরস্কার দিতে হইবে না।”

এই বলিয়া পুলিশ সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাত দুপুরে।

[ফরাসী হইতে]

আমি তখন নিতান্ত শিশু—পথে, মাঠে, ঘাটে খেলিয়া বেড়াইতাম, হাতে খড়ি হইলেও নিয়মিত পড়িতে আরম্ভ করি নাই। কাকাবাবুই ছিলেন আমাদের অভিভাবক। তাঁহার স্বভাবের মধ্যে কি জানি কেমন একটা সুন্দর মধুর গাম্ভীর্য্য ছিল যাহার জন্য তাঁহাকে আমরা যেমন ভয় করিতাম তেমনি ভালবাসিতাম।

কাকাবাবুর একটা বড় শঙ্খ ছিল। সে রকম বড় শঙ্খ সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। আর আমরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে—সমুদ্রের অত দূরে থাকি—আমরা ত অত বড় শঙ্খ না দেখিলে ধারণাতেও আনিতে পারিতাম না। কোন বন্ধু নাকি বিদেশ হইতে কাকাবাবুর জন্য এই শঙ্খটি আনিয়াছিলেন। শঙ্খটি থাকিত কাকাবাবুর

শোবার ঘরের একটা সেলফের উপর। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছেলের দল—অবাক হইয়া শঙ্খের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতাম—কিন্তু তবুও তার আদি অন্ত পাইতাম না। কেউ বলিত এর জন্ম সমুদ্রে, কেউ বলে এর জন্ম পাহাড়ে। কেউ বলিত উহা আসিয়াছে সাইবিরিয়া হইতে, কেউ বলিত উহা আসিয়াছে হিমালয় হইতে। একদিন কাকাবাবু বাড়ীতে ছিলেন না। আমরা তাঁহার শোবার ঘরে শঙ্খের দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া এমনই কত জল্পনা কল্পনা করিতেছি, এই সময় কাকাবাবু হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন,

"মজার কথা বটে, কিন্তু তোমাদের আরও মজা দেখাইতেছি," এই বলিয়া তিনি শঙ্খটি আমাদের কাণের কাছে ধরিয়া বলিলেন,

"কাণ দেও দেখি শঙ্খের ভিতর, কি শুনিতেছ ?"

আমরা প্রত্যেকেই একে একে শঙ্খের কাছে কাণ আনিলাম। কিন্তু একি শুনি! ভিতর

হইতে কত রকমের শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম—

কে আবার কখনও

বাতাসের শব্দের ন্যায় কল্লোল—যেন কোন দূর বন হইতে আসিতেছে। আমরা অবাক হইয়া এ-ওর মুখের দিকে তাকাইলাম।

কাকাবাবু বলিলেন, "কিসের শব্দ এ বলিতে পার?"

আমরা ত কিছুই জানিতাম না, কি বলিব?

তখন কাকাবাবু তাঁহার সেই শান্ত ধীর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,

"বাবা, এই যে শব্দ শুনিলে এ কিসের শব্দ তা কি তোমরা জান? তোমাদের মাথায়, বুকে, পিঠে সর্ব্বাঙ্গে যে রক্ত ছুটাছুটি করিতেছে এ তাহারই শব্দ। কোথাও বা সে রক্ত ক্ষুদ্র ঝরণার মত কুলুকুলু শব্দে চলিয়াছে, আর কোথাও বা জলপ্রপাতের ন্যায় হুহুরবে ছুটিয়াছে; খাল বিলের ন্যায় কখনও বা অতি ধীরে চলে, আবার কখনও বা বড় বড় নদীর মত ভীষণ শব্দ করিতে

করিতে ছোটে। যেমন বৃষ্টির জল আসিয়া পৃথিবীকে বাঁচাইয়া রাখে, তেমনি এই রক্তও আমাদের দেহের প্রত্যেক অঙ্গকে সজীব রাখে—ইহার গতি সর্ব্বত্র, চুলের ডগাটি হইতে আরম্ভ করিয়া পার তলাটিতে পর্য্যন্ত। তোমরা ত পর্ব্বত গহ্বরে গান কিংবা চীৎকার করিয়া সে শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিয়াছ। এ শঙ্খের ভিতরও ঠিক তেমনি তোমার ভিতরে যে কাণ্ড চলিতেছে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছ। কিন্তু, শঙ্খটি একবার খুব কাণের কাছে আনিয়া ধর দেখি, তখনও প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে। কিন্তু সে প্রতিধ্বনি তোমার অন্তরে চিন্তা ও ভাবনার প্রতিধ্বনি—মনে হইবে আকাশ পৃথিবীর যত স্বর আছে সব স্বরই যেন সেখানে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমরা প্রত্যেকেই যে এক একটি ছোট খাটো পৃথিবী। হায়রে মানুষ! এক মুহূর্ত্তে চিন্তা ও ভাবনার রাজ্য ঐ মাথাটার মধ্যে কত যে সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহার মাত্র একটা দূরে

আভাস পাও ঐ শব্দটার মধ্যে, কিন্তু তাহার শতাংশের একাংশের খবরও যদি জানিতে পারিতে তবে পরমেশ্বরের অসীম অনুগ্রহের কথা মনে না করিয়া থাকিতে পারিতে না।”

এই বলিয়া কাকা বাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তাহার পর বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

“এখন তোমরা হয়ত আমার সব কথা বুঝিতে পারিতেছ না, কিন্তু যখন মানুষ হইবে—যখন বড় হইবে, তখন বুঝিবে আমার প্রত্যেক কথাটি কিরূপ সত্য। আর ততদিন তোমরা, বাবা, পাপের পথ হইতে দূরে থাকিও, নিজের কু-প্রবৃত্তি গুলিকে বশে রাখিও। তোমাদের প্রত্যেকের দেহ ও মন এক একটি ছোটখাট পৃথিবী। ঈশ্বর যেমন সূর্য্যকে পাঠাইয়াছেন আমাদের এই পৃথিবী আলোকিত করিতে, তেমনি সু-প্রবৃত্তিকে পাঠাইয়াছেন আমাদের প্রত্যেকের এই ছোটখাট পৃথিবীকে আলোকিত করিতে। আলস্য করিও না, অন্যায় করিও না, মিথ্যা বলিও না। এ সব

বিশ্রী জিনিস মেঘের ন্যায় নীচু হইতে উঠিয়া ঈশ্বর প্রেরিত সু-প্রবৃত্তির আলোকের পথে ছায়া দেয়, আলোককে ঢাকিয়া রাখে ;—যদি তুমি তোমার প্রবৃত্তিকে এই সব মেঘের উপরে রাখিতে পারো তবেই তোমাদের প্রবৃত্তি সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবে—এবং তাহা হইলেই তোমরা সুখী হইবে।”

[illegible] চুপ করিলেন। আমরাও সেই দিন হইতে স্থির করিলাম মেঘকে চিনিলাম—মেঘকে কিছুতেই আর সূর্য্যের কাছে আসিতে দেওয়া হইবে না।

আজও আমার সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে,—কত দিন, কত রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে, কত কি ঘটনা তাহার পর ঘটিয়াছে কিন্তু এক দিনের জন্যও শঙ্খটি পুরাণ হয় নাই। কত দিন সারা সকাল বসিয়া শঙ্খের ভিতরের কলকল শব্দ শুনিয়াছি। তখন ভাবিতাম কি জান? ভাবিতাম আমাদের এই ছোটখাট পৃথিবীটার কথা, যদি

একটা গর্ত থাকিত এবং তাহার মধ্য দিয়া সব জিনিস দেখা যাইত—কি চমৎকারই না হইত।

এমনি শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইত বুঝিবা আমার মনের সব কথাও শঙ্খের ভিতর দিয়া শুনিতে পাইতেছি, আমার চিন্তার ধারাও বুঝি বা সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে ধ্বনি কখনও আনন্দের, কখনও দুঃখের।

একদিন শঙ্খটা ভারী বেসুরো বাজিতে লাগিল। সে কি কর্কশ ধ্বনি! আমি ভারি ভয় পাইলাম। কিন্তু আমার ত কিছু বলিবার ছিল না। দোষ যে আমারই। সেই কথাই বলিব।

আমি ও আমার বন্ধু একদিন মাঠে বেড়াই-তেছি, এই সময়ে বন্ধু বলিল, "ঐ দেখ পাখীর বাসা, ওখানে পাখীর ছানা আছে—আমি দেখিয়াছি। কালকেই তাদের পালক গজাইবে —সুতরাং আজই কাজ শেষ করা চাই।"

কোথা হইতে রাজ্যের শয়তান আসিয়া আমার মাথায় চাপিয়া বসিল। দেহ মন তখন

আঁধার মেঘে ঢাকা। কোন কথা বলিতে পারিলাম না। শয়তান আমাকে সেই গাছের তলায় ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

গাছটি ছিল খুব উঁচু, তাই পাশের একটি ছোট গাছে উঠিয়া, সেখান হইতে বড় গাছে উঠিলাম। একটা ডালে পা দিয়া পাখীর ছানা পাড়িবার জন্য হাত বাড়াইলাম। সেদিনকার কথা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। সেই মর্দ্দা ও মাদী পাখী দুটার সে যে কি চীৎকার! আমার সমস্ত অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পরমুহূর্ত্তেই আমি শূন্যে ঝুলিতে লাগিলাম। যে ডালে দাঁড়াইয়াছিলাম, সে ডাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, আর একটা ডাল কোন ক্রমে ধরিয়া সে যাত্রা বাচিয়া গেলাম।

গাছ হইতে নীচে নামিয়া দেখি, পাখীর বাসা নীচের একটা খালে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে, আর পাখী দুটার করুণ, আর্ত্ত ক্রন্দনে আকাশ পাতাল কাঁপিয়া উঠিতেছে।

বাড়ী ফিরিবার পথে বন্ধুর সঙ্গে দেখা। আমাকে সুস্থ দেখিয়া সে ভারী খুসী। আমার তখন পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল না, অতি কষ্টে বলিলাম,—

"কাউকে কিছু বলিও না।"

বন্ধু আমার কাঁধ চাপড়াইয়া বলিল,

"সে বিষয়ে ভাই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

সেই রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শঙ্খটি কাণের কাছে আনিয়া ধরিলাম। হরি! হরি! একি শব্দ! যেন স্রোতস্বিনী, জলপ্রপাতের ভীষণ গর্জ্জন, আর মধ্যে মধ্যে পাখী দুটার সেই আর্ত্ত-নাদ, আর গাছ নড়ার সেই শোঁ শোঁ শব্দ। সব কথা আমার মনে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কি ভয়ানক! ভয়ে তখনও আমি কাঁপিতেছিলাম! অত চেষ্টা করিয়াও তাই ঘুম আসিল না!

এই রকমে কতক্ষণ কাটিল, কিন্তু ঘুম আসিল না। যতই রাত্রি হইতেছিল ততই মনে হইতে লাগিল আমার সমস্ত মনটা কাল কাল চিন্তাতে

ছাইয়া যাইতেছে। কান্না আমার গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কি জানি কেন গলায় আটকাইয়া গিয়াছিল। আমি ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম।

রাত দুপুরে এই যন্ত্রণা আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে কাকাবাবুর বিছানার পাশে যাইয়া দাঁড়াইলাম। কাকাবাবু শব্দ শুনিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। আমি তাহার শিয়রের কাছে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনিও তেমনি বিস্মিত হইয়াছিলেন, বলিলেন,

"কি হইয়াছে বাবা, রাত দুপুরে এখানে কেন?"

আমি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম, বলিলাম, "কাকাবাবু, মাপ করুন আমায়, আমি ভয়ানক অন্যায় করিয়াছি।"

"কেন, কি করিয়াছ তুমি?"

"গাছের ডালে উঠিয়া পাখীর বাসা চুরী করিতে যাইতেছি, এই সময় ডালটি ভাঙ্গিয়া পড়ে।"

“কি হইয়াছে বাবা, রাত দুপুরে এখানে কেন ?’

"কি সর্ব্বনাশ! একদম ভাঙ্গিয়া গেল!"

"এ যাত্রা ভগবান আমায় রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সেই পাখী দুটা তাদের ছানার জন্য আমাকে ক্রমাগত শাসাইতেছে, ক্রমাগত আমার চারিদিকে তারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—আমাকে ঘুমাইতে দিবে না।"

কাকাবাবু গম্ভীর হইয়া আমার কথা শুনিতেছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। চোখের জলে তখন আমার সমস্ত বুক ভাসিয়া গিয়াছিল। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম,

"কাকাবাবু, শঙ্খের ভিতর আজ কাণ দিয়া শুনি সেখানকার সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে, হয়ত তেমনটি আর শুনাইবে না।"

কাকাবাবু তখন আমাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,

"এবার তোমায় মাপ করিলাম। এখন শান্ত হও। কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ইহাতেই যেন তোমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়। একবার

মনে করিয়া দেখ দেখি, ঈশ্বর না করুন, যদি তোমারই এইরূপ মৃত্যু ঘটিত তবে আমার কত কষ্ট হইত ! সেই শিশু পাখীর মা বাপদের ত ইহা অপেক্ষা কিছু কম দুঃখ হইবার কথা নহে। তোমার আর এ কথা তখন নিশ্চয়ই মনে আসে নাই। তবে এখন যখন তুমি অনুতপ্ত তখন তোমায় আমরা সবাই মাপ করিলাম !

তারপর এক গ্লাস সরবৎ দিয়া আমাকে বলিলেন, এইটুকু খাইয়া ঘুমাইয়া পড়। সে বেচারী পাখীরা আর তোমার কাছে আসিবে না। পাপের জন্য যখন তুমি অনুতাপ করিয়াছ তখনই ঈশ্বর তোমায় মাপ করিয়াছেন। এখন তুমি শান্তিতে ঘুমাইতে পারিবে।"

তাহার পর আমি স্কুলে লেখাপড়া শিখিয়াছি, বড় হইয়াছি, কিন্তু এখনও আমি সময়ে সময়ে ভিতর কাণ দিয়া শুনি। সব সময়েই যে এখন শঙ্খের তাহাতে আনন্দের সুর শোনা যায় তাহা নয়, দুঃখের সনয়, দুঃখের করুণ স্বরও শঙ্খে প্রতিধ্বনিত

হইতেছে শুনি, কিন্তু সে দিনকার সেই পাখীর বাসা ভাঙ্গিবার পর যে ভীষণ কোলাহল শুনিয়াছিলাম, তেমনটি আর শঙ্খে কোনও দিনও শুনি নাই।

ভাই সব, মনে রাখিও, ধন থাকুক কি নাই থাকুক, বিবেকের জেরায় যে ভয় পায় না সেই এ জগতে প্রকৃত সুখী।

সমাপ্ত